HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ০১ জাতীয় সংসদ

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: জাতীয় সংসদ
টপিক ০২: জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী
টপিক ০৩: সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
টপিক ০৪: জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি
টপিক ০৫: স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার
টপিক ০৬: আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা
টপিক ০৭: বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি
টপিক ০৮: বাংলাদেশ সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী
টপিক ০৯: বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী
টপিক ১০: বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কাঠামো
টপিক ১১: সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগের অবস্থান

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: সুপ্রিম কোর্ট
টপিক ১৩: সুপ্রিম কোর্টের 'পর্যালোচনা ক্ষমতা'
টপিক ১৪: বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
টপিক ১৫: বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো
টপিক ১৬: সচিবালয় ও মন্ত্রনালয় সম্পর্ক
টপিক ১৭: সচিব
টপিক ১৮: বিভাগীয় প্রশাসন ও বিভাগীয় কমিশনার
টপিক ১৯: জেলা প্রশাসন ও ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)
টপিক ২০: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ২১: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: জাতীয় সংসদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জাতীয় সংসদ

রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সরকার। সরকার রাষ্ট্রের মুখপাত্র। সরকার গঠিত হয় আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে নিয়ে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সরকারের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ সমন্বয়ে। এ অধ্যায়ে জাতীয় সংসদের গঠন ও কার্যাবলি; রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি; সুপ্রিম কোর্টের গঠন ও ক্ষমতা, সচিবালয়ের গঠন ও কার্যাবলি এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

জাতীয় সংসদ

ক. জাতীয় সংসদের পরিচিতি (Introduction of Jatiyo Sangsad): বাংলাদেশ সংবিধানে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশের আইনসভার নাম 'জাতীয় সংসদ'। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, 'জাতীয় সংসদ' নামে "বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকবে এবং এ সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হবে"। রাজধানী ঢাকায় জাতীয় সংসদের স্থায়ী আসন থাকবে।

জাতীয় সংসদ

খ. জাতীয় সংসদের গঠন (Composition of the Jatiyo Sangsad): জাতীয় সংসদের সাধারণ আসন সংখ্যা ৩০০। একক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকাসমূহ হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। এছাড়া ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।২ তাঁরা সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। তবে মহিলারা সংরক্ষিত আসন ছাড়াও সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন।

গ. সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা (Qualifications and Disqualifications of Membership of the Jatiyo Sangsad)

যোগ্যতা (Qualification): জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হতে হলে কোনো ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে:

১. তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;

২. তাঁকে অন্যূন ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে;

৩. তাঁর নাম সংসদ-সদস্যের নির্বাচনে ভোটার তালিকাভুক্ত হতে হবে।

জাতীয় সংসদ

অযোগ্যতা (Disqualification): কোনো ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হবার এবং সংসদ সদস্য থাকার যোগ্য হবেন না; যদি তিনি-

ক. কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হন;

খ. দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর দায় হতে অব্যাহতি লাভ না করে থাকেন;

গ. কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;

ঘ. নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছরকাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে;

ঙ. ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন যে কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়ে থাকেন;

চ. আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করছে না এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা, ইস

ছ. কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হন।

জাতীয় সংসদ

ঘ. সংসদ সদস্য পদের আসন শূন্য হওয়ার কারণ" (Causes of Vacancy or vacation of Seats) : সংবিধানের ৬৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে; যদি-

১. ক. তাঁর নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে নব্বই দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করতে অসমর্থ হন;

খ. সংসদের অনুমতি না নিয়ে তিনি একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন;

গ. সংসদ ভেঙে যায়;

ঘ. তিনি নির্বাচিত হবার পর এ সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন অযোগ্য ঘোষিত হন; অথবা

ঙ. কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হবার পর উক্ত দল হতে পদত্যাগ করেন বা বহিষ্কৃত হন। ৬

২. কোনো সংসদ-সদস্য স্পিকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারেন।

জাতীয় সংসদ

ঙ. সংসদের মেয়াদ (Tenure of Sangsad): জাতীয় সংসদের কার্যকাল ৫ (পাঁচ) বছর। তবে উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে না দিলে প্রথম অধিবেশনের দিন হতে পাঁচ বছর অতিবাহিত হলে সংসদ স্বাভাবিকভাবে ভেঙে যাবে। তবে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, প্রজাতন্ত্র কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে তাহলে সংসদ আইন দ্বারা অনধিক এক বছরকাল সংসদের মেয়াদ বাড়াতে পারেন। তবে যুদ্ধ শেষ হলে বর্ধিত মেয়াদ কোনোক্রমে ছয় মাসের অধিক করা যাবে না। ৭

চ. কোরাম (Quorum): সংবিধান অনুযায়ী কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ চলবে।

অর্থাৎ ৬০ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় সংসদের 'কোরাম' গঠিত হবে। জাতীয় সংসদের বৈঠক চলাকালে কোনো সময়ে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ষাটের (৬০) কম বলে যদি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তিনি অন্যূন ৬০ জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখবেন কিংবা মুলতবি করবেন।

জাতীয় সংসদ

ছ. অধিবেশন : জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের পর সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করবেন। এছাড়াও রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ও ভেঙে দিতে পারবেন।৮ জাতীয় সংসদের অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন। জাতীয় সংসদ অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যদের দ্বারা বিভিন্ন 'সংসদীয় স্থায়ী কমিটি' গঠিত হবে।

জ. সংসদে উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ: কোনো ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনি এলাকার সংসদ- সদস্য হবেন না। যদি কেউ একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনি এলাকা থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন, তা হলে নির্বাচনের ৩০ দিনের মধ্যে তিনি কোন্ নির্বাচনি এলাকার প্রতিনিধিত্ব করতে চান তা নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে। তা না হলে তাঁর সকল আসন শূন্য হবে। সংবিধানের ৬৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্বাচিত হিসেবে শপথগ্রহণ ও স্বাক্ষরদান করবেন। নইলে তাঁর সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে।

জাতীয় সংসদ

কোনো জাতীয় সংসদ সদস্য যদি সংসদের অনুমতি না নিয়ে একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তাঁর আসন শূন্য হবে। অবশ্য জাতীয় সংসদ ভেঙে গেলেও সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে।

যদি কোনো সংসদ সদস্য কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হয়ে পরবর্তী সময়ে উক্ত দল থেকে পদত্যাগ করেন বা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দান করেন, তা হলে তাঁর আসন শূন্য হবে।

জাতীয় সংসদ

ঝ. সংসদীয় কমিটি : জাতীয় সংসদের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংবিধানের ৭৬ (১) অনুচ্ছেদে তিন ধরনের স্থায়ী কমিটির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো- ১. সরকারি হিসাব কমিটি, ২. বিশেষ অধিকার কমিটি, ৩. অন্যান্য স্থায়ী কমিটি। এছাড়াও রয়েছে কার্য উপদেষ্টা কমিটি, বেসরকারি সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত বাছাই কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কমিটি, লাইব্রেরি কমিটি, সংসদ কমিটি ও বিশেষ কমিটি।

ঞ. কার্যপ্রণালি বিধি: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নিজস্ব 'কার্যপ্রণালি বিধি' রয়েছে। এসব বিধি দ্বারা জাতীয় সংসদের কাজ সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয়। কীভাবে জাতীয় সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভেঙে দেয়া যায়, কীভাবে সংসদ সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন, সংসদে প্রশ্ন উত্থাপন পদ্ধতি, সংসদ সদস্যদের পালনীয় বিধি প্রভৃতি সম্পর্কে কার্যপ্রণালি বিধিতে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকে।

ট. জাতীয় সংসদের ভাষা: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ভাষা বাংলা। সংসদের কার্যবিবরণীর সরকারি রেকর্ড বাংলা ভাষায় সংরক্ষিত হয়। তবে কোনো সদস্য চাইলে স্পিকার তাঁকে ইংরেজিতে বক্তব্য রাখার অনুমতি প্রদান করতে পারেন।

জাতীয় সংসদ

ঠ. জাতীয় সংসদ এবং এর সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি

Privileges and Immunities of the Sangsad and Members

১. সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

২. সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্যপ্রণালি নিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা থাকবে, তিনি এ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে কোনো আদালতের এখতিয়ারের অধীন হবেন না।

৩. সংসদে বা সংসদের কোনো কমিটিতে কিছু বলা বা ভোট দানের জন্য কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যায় না।

৪. সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বের কোনো রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোটে বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যায় না।

৫. এ অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে সংসদের আইন দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা যাবে।

ঠ. জাতীয় সংসদ এবং এর সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি[৯]

Privileges and Immunities of the Sangsad and Members

১. সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

২. সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্যপ্রণালি নিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা থাকবে, তিনি এ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে কোনো আদালতের এখতিয়ারের অধীন হবেন না।

৩. সংসদে বা সংসদের কোনো কমিটিতে কিছু বলা বা ভোট দানের জন্য কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যায় না।

৪. সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বের কোনো রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যায় না।

৫. এ অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে সংসদের আইন দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা যাবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ০২ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

টপিক ০২: জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

বাংলাদেশ সংবিধান সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করায় জাতীয় সংসদই সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। নিম্নে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করা হলো:

১. আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Legislative Powers and Functions): গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সমগ্র অংশ কিংবা যে কোনো অংশে বলবৎযোগ্য আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে ন্যস্ত। জাতীয় সংসদ যে কোনো নতুন আইন তৈরি, প্রচলিত আইন সংশোধন এবং অপ্রয়োজনীয় আইন বাতিল করতে পারে। সাধারণ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদ সরকারি নীতি নির্ধারণ করে। তবে জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান বা উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবেন। এক অধিবেশনের সমাপ্তি এবং পরবর্তী অধিবেশনের মধ্যে ৬০ দিনের বেশি বিরতি থাকবে না।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

সংসদ কর্তৃক কোনো বিল গৃহীত হলে সম্মতির জন্য তা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হয়। রাষ্ট্রপতির নিকট কোনো বিল পেশ করার পর পনের দিনের মধ্যে তিনি তাতে সম্মতি দান করবেন কিংবা অর্থ বিল ব্যতীত অন্য কোনো বিলের ক্ষেত্রে বা বিলটি বা তার কোনো বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোনো সংশোধনী বিবেচনার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে একটি বার্তাসহ সংসদে ফেরত দিতে পারেন। কিন্তু তা' করতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি প্রদান করেছেন বলে গণ্য হবে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুরূপভাবে ফেরত পাঠানো বিল সংসদে পুনরায় গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি সাত দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দান করবেন কিংবা উক্ত মেয়াদের মধ্যে সম্মতি প্রদানে ব্যর্থ হলে ৭ দিন পরে বিলটি স্বাভাবিকভাবে আইনে পরিণত হবে। সুতরাং আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ সার্বভৌম।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

২. শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Executive Powers and Functions): সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ 'ব্যক্তিগত' বা 'যৌথভাবে' তাঁদের কাজের জন্য সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। ১০ মন্ত্রিগণ যতক্ষণ সংসদের আস্থা ভোগ করবেন, ততক্ষণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, নিন্দামূলক প্রস্তাব এনে, বাজেট আলোচনা-সমালোচনা করে, মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করে জাতীয় সংসদ মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সংসদের অনাস্থায় মন্ত্রিপরিষদ অপসারিত হবে। সুতরাং নির্বাহী বিভাগের ওপর জাতীয় সংসদের নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব (Control over executive) খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. সরকার গঠন সংক্রান্ত ক্ষমতা: সাধারণ নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 'সংসদীয় নেতাকে' (Parliamentary leader) প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করেন এবং মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। জাতীয় সংসদের আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতা হারাতে হয়।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৪. বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Judicial Powers and Functions): জাতীয় সংসদ বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ভোগ ও কার্যাদি সম্পন্ন করে। সংবিধান লঙ্ঘন, গুরুতর অপরাধ বা অসদাচরণের জন্য কিংবা দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতার জন্য সংসদ দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারিত করতে পারে। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী আইন পাসের ফলে জাতীয় সংসদ দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে বিচারপতি অপসারণ করার ক্ষমতা ফিরে পায়। সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত অন্যান্য অধঃস্তন আদালত প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে ন্যস্ত। এছাড়াও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং এর সংখ্যা, ক্ষমতা ও দায়িত্ব জাতীয় সংসদে প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। জাতীয় সংসদ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অপরাধের কারণে স্পীকার, ডেপুটি স্পীকারকেও অপসারণ করতে পারে।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৫. অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Financial Powers and Functions): সংসদের অনুমোদন ব্যতীত কোনো কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যায় না। সংসদ আইনবলে সরকারি অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে। সরকারের বার্ষিক অনুমিত আয়-ব্যয় সংবলিত একটি বিবৃতি অর্থাৎ 'বাজেট' সংসদে প্রতি বছর উপস্থাপন করা হয়। সংযুক্ত তহবিলের ওপর ধার্য ব্যয়সমূহের ওপর সংসদে ভোট গ্রহণ করা না গেলেও সে সম্পর্কে সংসদে আলোচনা হয়। কতগুলো মঞ্জুরি দাবি সংসদে পেশ করা হয় এবং সংসদ এরূপ দাবি অনুমোদন, প্রত্যাখ্যান বা এতে নির্ধারিত অর্থের পরিমাণ হ্রাস করতে পারবে। বাজেট পেশ করার পর যদি কোনো অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে জাতীয় সংসদ অগ্রিম মঞ্জুরি দানের ব্যবস্থা করতে পারবে। তবে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন মঞ্জুরি দাবি করা যাবে না। সুতরাং জাতীয় সংসদ হচ্ছে জাতীয় অর্থের অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রণকারী।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৬. সংবিধান-সংশোধন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Constitution-Amending Powers and Functions) : বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা একচ্ছত্রভাবে একমাত্র জাতীয় সংসদের হাতেই ন্যস্ত। সংসদ মোট সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন করতে পারবে।

৭. চাকরি-সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Appointment Powers and Functions): সংসদ আইনবলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে বা চাকরিতে কর্মচারিগণের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। সংসদের আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মবিভাগ ও সার্ভিসসমূহ সৃষ্টি ও পুনর্গঠন করা যাবে।

৮. নির্বাচন ও অপসারণ সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Election and Impeachment Functions): জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রপতি, স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার ও বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি নির্বাচন করার ক্ষমতা ভোগ করে। সংসদ তাদেরকে অপসারণ করার ক্ষমতারও অধিকারী। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসনের সদস্যগণ সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৯. অধ্যাদেশ সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Ordinance making Powers and Functions): রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'অধ্যাদেশ' জারি হবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তা উপস্থাপিত হবে এবং ইতোপূর্বে বাতিল না হয়ে থাকলে * তা অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে কিংবা অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে তা' অনুমোদন করে সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হলে এর কার্যকারিতা লোপ পাবে। সংসদে এ সকল অধ্যাদেশ অনুমোদিত হলে তা আইনে (Act) পরিণত হবে।

১০. সামরিক বিষয় সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Military Powers and Functions): জাতীয় সংসদ সামরিক ক্ষমতাও ভোগ করে। প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের সংরক্ষণ এবং এগুলোতে লোক ভর্তি ও কমিশন মঞ্জুরি ইত্যাদি বিষয় সংসদের আইনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সংসদের সম্মতি ছাড়া কোন যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না বা দেশ কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে না।১৩ বৈদেশিক আক্রমণ ঘটলে বা আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলে সংসদ অধিবেশনে না থাকলে একে অনতিবিলম্বে আহ্বান করার বিধান রয়েছে। যুদ্ধ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের সময় জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সংসদ যে কোনো আইন তৈরি করতে পারে।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১১. জরুরি অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Declaration of Emergency): বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীবলে রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। তবে সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'জরুরি অবস্থা জারি বা ঘোষণা' সংক্রান্ত এই ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। জাতীয় সংসদের অনুমোদন ছাড়া জরুরি অবস্থা জারি বা ঘোষণা নির্দিষ্ট সময়ের পর অকার্যকর হয়ে যাবে।

১২. অন্যান্য কাজ সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Miscellaneous Powers and Functions): রাষ্ট্রপতির পদসহ কতগুলো পদের বেতন ও শর্ত সংসদই নির্ধারণ করে। সংসদ কোনো ব্যক্তিকে কতগুলো ক্ষেত্রে দায়মুক্ত করতে পারে। তাছাড়া জাতীয় সংসদ সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত অন্যান্য অধঃস্তন আদালত, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সংসদ স্থানীয় সরকারগুলোর ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করতে পারে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ০৩ সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

টপিক ০৩: সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

জাতীয় সংসদ সদস্যগণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করলে এবং জনগণের দাবি-দাওয়া ঠিকমত জাতীয় সংসদে উত্থাপন করতে সক্ষম হলে জনগণ একজন সংসদ সদস্যকে পুনরায় নির্বাচিত করবেন এরূপ আশা করাই স্বাভাবিক। এছাড়াও সংসদ সদস্য যে দলের প্রতিনিধি-সে দল যদি জনগণের সমর্থন ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে তাহলেও তার পক্ষে সংসদ সদস্য হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়া সম্ভব নয়। একজন সংসদ সদস্য এজন্যই জনমতকে অস্বীকার করতে কিংবা এলাকার জনগণের স্বার্থবিরোধী কোনো ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না। জাতীয় সংসদ সদস্যদের ওপর জননিয়ন্ত্রণ পরোক্ষ হলেও এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। পরোক্ষভাবে তাঁরা জনঅধীন। কেননা জনগণের রায়েই তাঁদেরকে সংসদ সদস্য হতে হয়। নির্বাচনের পূর্বে তাঁদেরকে নিজ নিজ কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। তবে বাংলাদেশে এ জননিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহিতা সুইজারল্যান্ডের মতো প্রত্যক্ষ নয়। কেননা সুইজারল্যান্ডে 'পদচ্যুতি' (Recall) ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের অজ্ঞতা, শিক্ষার অভাব, সচেতনতার অভাব, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অভাব প্রভৃতি কারণে এখনো জননিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা পুরোপুরি সার্থক হয়ে ওঠেনি। তবে সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে আশা করা যায় যে, অচিরেই সংসদ সদস্যদের জবাবদিহিতা, কর্তব্য ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ০৪ জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি

টপিক ০৪: জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি

আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হয়। জাতীয় সংসদে উত্থাপিত আইনের খসড়াকে 'বিল' (Bill) বলে। বিল দু'প্রকারের: (১) সরকারি বিল, (২) বেসরকারি বিল। সরকারি বিল মন্ত্রিগণ উত্থাপন করেন এবং বেসরকারি বিল জাতীয় সংসদের সাধারণ সদস্যগণ উত্থাপন করেন। সরকারি বিল উত্থাপনের জন্য ৭দিনের সময় এবং বেসরকারি বিলের জন্য ১৫ দিনের নোটিস প্রয়োজন হয়। বিল উত্থাপনের পর এর প্রথম পাঠ শেষে তা সংসদ কর্তৃক গৃহীত হতে পারে বা স্থায়ী কমিটির নিকট প্রেরিত হতে পারে। দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলের বিভিন্ন ধারা-উপধারা সম্পর্কে আলোচনা ও সংশোধন করা হয়। তৃতীয় পাঠের সময় বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হলে স্পিকার তা সত্যায়িত করেন এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করেন। সংসদ কর্তৃক কোনো বিল তৃতীয় পাঠের পর গৃহীত হলে সম্মতির জন্য তা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হয়। রাষ্ট্রপতির নিকট কোনো বিল পেশ করার পর পনের দিনের মধ্যে তিনি তাতে সম্মতি দান করবেন কিংবা অর্থ বিল ব্যতীত অন্য কোনো বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তার কোনো বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোনো সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করে একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করছেন বলে গণ্য হবে।

জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি

রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরত পাঠান তাহলে সংসদ রাষ্ট্রপতির বার্তাসহ তা পুনর্বিবেচনা করবেন এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করলে সম্মতিদানের জন্য তা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হবে। অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করবেন। রাষ্ট্রপতি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হবে। সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করলে বা তিনি সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হলে তা আইনে পরিণত হবে এবং সংসদের আইন (Act) নামে অভিহিত হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ০৫ স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার

টপিক ০৫: স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার

সংসদের স্পিকার একজন অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানীয় ব্যক্তি। তিনি সংসদ সভাপতি। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। সংসদের ভোটে তাঁরা অপসারিতও হবেন। মেয়াদ শেষে অথবা কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলেও স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের বেতন ও ভাতা 'সংযুক্ত তহবিলের দায়মুক্ত ব্যয়' থেকে বরাদ্দ হবে। জাতীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকেই স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন।

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার এই দুই পদের যে কোনোটি শূন্য হলে সাত দিনের মধ্যে কিংবা ঐ সময়ে সংসদ বৈঠকরত না থাকলে পরবর্তী বৈঠকে তা' পূর্ণ করার জন্য সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে একজনকে নির্বাচিত করবেন।

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার

স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের পদ শূন্য হবে, যদি-

(ক) তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন;

(খ) তিনি মন্ত্রী পদ গ্রহণ করেন;

(গ) পদ হতে তার অপসারণ দাবি করে মোট সংসদ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সমর্থিত কোনো প্রস্তাব সংসদে গৃহীত হয়;

(ঘ) তিনি স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতির নিকট তার পদত্যাগ পত্র পেশ করেন;

(ঙ) কোনো সাধারণ নির্বাচনের পর অন্য কোনো সদস্য তার কার্যভার গ্রহণ করেন এবং

(চ) ডেপুটি স্পিকারের ক্ষেত্রে, তিনি যদি স্পিকারের পদে যোগদান করেন।

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার

স্পিকারের পদ শূন্য হলে বা তিনি রাষ্ট্রপতিরূপে কাজ করলে কিংবা অন্য কোনো কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ বলে সংসদ নির্ধারণ করলে স্পিকারের সকল দায়িত্ব ডেপুটি স্পিকার পালন করবেন, কিংবা ডেপুটি স্পিকারের পদও শূন্য হলে সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী কোনো সংসদ সদস্য তা' পালন করবেন। সংসদের কোনো বৈঠকে স্পিকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার কিংবা ডেপুটি স্পিকারও অনুপস্থিত থাকলে সংসদের কার্যপ্রণালি-বিধি মোতাবেক কোনো সংসদ সদস্য স্পিকারের দায়িত্ব পালন করবেন।

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Powers and Functions of Speaker and Deputy Speaker) : স্পিকার সংসদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তাঁর অবর্তমানে ডেপুটি স্পিকার সভাপতিত্ব করবেন। রাষ্ট্রপতি অনুপস্থিত থাকলে অথবা কোনো কারণে সাময়িকভাবে কাজ করতে সক্ষম না হলে স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। স্পিকার জাতীয় সংসদের নেতার সাথে পরামর্শ করে সংসদের কার্যপ্রণালি নির্ধারণ করবেন। সাধারণ নিয়মানুযায়ী স্পিকার সংসদের বৈঠক স্থগিত করবেন এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি সাময়িকভাবে সংসদের বৈঠক বন্ধ রাখতে পারবেন। শৃঙ্খলাজনিত কারণে তিনি কোনো সংসদ সদস্যকে সতর্ক করতে পারবেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে তিনি কোনো সদস্যকে বহিষ্কার করতে পারবেন।

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার

তিনি নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন। তিনি সংসদ সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা ও মান-মর্যাদা রক্ষা করবেন। তিনি সংসদ অধিবেশনে লক্ষ রাখবেন যাতে সুষ্ঠুভাবে বিধি-বিধান অনুযায়ী সংসদের কার্যাবলি পরিচালিত হয়। স্পিকার সাধারণত সংসদ-বিতর্কে অংশগ্রহণ করবেন না। যখন কোনো বিষয়ে দুই পক্ষ সমানভাবে বিভক্ত হয় তখন স্পিকার 'নির্ণায়ক ভোট' (Casting vote) দিবেন। স্পিকার কোনো দলভুক্ত থাকলেও নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি নির্দলীয় বা নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে সংসদে দায়িত্ব পালন করবেন। জাতীয় সংসদে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। রাষ্ট্রপতি অনুপস্থিত থাকলে অথবা অন্য কোনো কারণে সাময়িকভাবে কাজ করতে সক্ষম না হলে স্পিকার রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন। সাধারণ নির্বাচনের পর নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যগণকে পূর্ববর্তী সংসদের স্পিকার শপথ পাঠ করাবেন। স্পিকারের অবর্তমানে বা অন্যকোনো কারণে সাময়িকভাবে কাজ করতে সক্ষম না হলে ডেপুটি স্পিকার স্পিকারের দায়িত্ব পালন করবেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ০৬ আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা

টপিক ০৬: আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বা কাজকর্মের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে। মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় কতদিন থাকবেন তা নির্ভর করে আইনসভার আস্থা-অনাস্থার ওপর। বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ 'ব্যক্তিগত' এবং 'যৌথভাবে' তাঁদের কাজের জন্য সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। মন্ত্রিগণ যতক্ষণ সংসদের আস্থা ভোগ করবেন, ততক্ষণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, নিন্দামূলক প্রস্তাব এনে, বাজেট আলোচনা-সমালোচনা করে, মূলতবী প্রস্তাব ও ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করে জাতীয় সংসদ মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

জাতীয় সংসদের অনুমোদন ব্যতীত সরকার কর আরোপ বা সংগ্রহ করতে পারে না। সংসদ আইনবলে সরকার অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে। জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের রক্ষক ও অভিভাবক। প্রত্যেক আর্থিক বছরের শুরুতে সে বছরের জন্য সরকারের অনুমিত আয়-ব্যয়ের বিবৃতি বা 'বাজেট' জাতীয় সংসদে পেশ করতে হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশে আইন বিভাগ অর্থাৎ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা, মর্যাদা ও ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রিসভাকে তাদের কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ০৭ বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি

টপিক ০৭: বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি জাতীয় সংসদ সদস্যগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতির নামে সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হয়। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি রাষ্ট্রের অন্য সকল পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করেন ও সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হবেন। তিনি সংবিধান ও আইনের দ্বারা তাকে প্রদত্ত ও তার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করবেন। পাঁচ বছরের মেয়াদে তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। ব্রিটেনের রানি বা ভারতের রাষ্ট্রপতির ন্যায় তিনি হলেন 'শাসনতান্ত্রিক প্রধান' (Constitutional Head) ।

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি

ক. রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা (Qualifications): কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হতে চাইলে তাঁর নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকতে হবে:

ক. তাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

খ. রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে অন্যূন পঁয়ত্রিশ (৩৫) বছর বয়স্ক হতে হবে।

গ. তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন।

ঘ. তিনি এমন ব্যক্তি হবেন যিনি কখনো এ সংবিধান অনুযায়ী অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হতে অপসারিত হননি।

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি

খ. নির্বাচন ও পদের মেয়াদ ১৯ (Election and Tenure) : রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

সংবিধানের '৫০(২) অনুচ্ছেদে' বলা হয়েছে যে, 'একাদিক্রমে হউক বা না হউক-দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।'

সংবিধানের '৫০(৩) অনুচ্ছেদে' বলা হয়েছে যে, 'স্পীকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।'

রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যভারকালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন না। কোনো জাতীয় সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবার পর রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ ও কার্যভার গ্রহণের দিন থেকে সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে। জাতীয় সংসদের স্পীকার রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকার্য পরিচালনা করবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি

গ. রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি (President's Immunity): রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি সম্পর্কে সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে,

১. অভিসংশনজনিত বিষয় ছাড়া, রাষ্ট্রপতি তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোনো কাজ করে থাকলে বা না করে থাকলে সেজন্য তাকে কোনো আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না। তবে এ দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণে কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে না।

২. রাষ্ট্রপতির কার্যভারকালে তার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারি কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না। রাষ্ট্রপতিকে গ্রেপ্তার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত হতে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি

ঘ. রাষ্ট্রপতির অভিসংশন২০ (Impeachment of the President): বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী ৫ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হলেও নিম্নলিখিত কারণে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারিত করতে পারবে:

১. সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিসংশিত করা যাবে। এজন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিপ্রায় ও অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিস স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হবে। স্পিকারের নিকট অনুরূপ নোটিস প্রদানের দিন হতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এ প্রস্তাব আলোচিত হতে পারবে না। সংসদ অধিবেশনরত না থাকলে স্পিকার অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করবেন।

২. অভিযোগ বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং উপস্থিত থাকতে পারবেন কিংবা প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবেন।

৩. অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে ঘোষণা করে জাতীয় সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রস্তাব গৃহীত হবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি

ঙ. অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ: সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৫৩ তে বলা হয়েছে যে, (১) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তার পদ হতে অপসারিত করা যেতে পারে। এ জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে কথিত অসামর্থ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হবে।

(২) সংসদ অধিবেশনরত না থাকলে নোটিশ প্রাপ্তিমাত্র স্পিকার সংসদের অধিবেশন আহ্বান করবেন এবং একটি চিকিৎসা-পর্ষদ গঠনের প্রস্তাব আহ্বান করবেন। প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হবার পর স্পিকার তৎক্ষণাৎ উক্ত নোটিশের একটি প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন এবং তার সাথে এই মর্মে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করবেন যে, অনুরূপ অনুরোধ জ্ঞাপনের তারিখ হতে দশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যেন পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হবার জন্য উপস্থিত হন।

(৩) অপসারণের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ স্পিকারের নিকট প্রদানের পর হতে ১৪ দিনের পূর্বে বা ৩০ দিনের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাবে না এবং অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য পুনরায় সংসদ আহ্বানের প্রয়োজন হলে স্পিকার সংসদ আহ্বান করবেন।

(৪) প্রস্তাবটি বিবেচিত হবার কালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকবার এবং প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকবে।
(৫) সংসদ কর্তৃক প্রস্তাবটি ও চিকিৎসা পর্ষদের রিপোর্ট বিবেচিত হবার পর সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হলে তা গৃহীত হবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

চ. অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্ব পালন: সংবিধানের '৫৪ অনুচ্ছেদে' বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি

ছ. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Powers and Functions of the President): সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

নির্বাহী ক্ষমতা ও কার্যাবলি: বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি একজন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান (Constitutional Head)। বাংলাদেশ সরকারের সকল নির্বাহী কার্যক্রম রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হবে। তিনি সরকারি কার্যাদি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ বা নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করবেন। রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত আদেশ-নির্দেশ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কীভাবে সত্যায়িত হবে রাষ্ট্রপতি তা বিধি দ্বারা নির্ধারণ করবেন। এগুলোর বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদেরকে নিয়োগ করবেন। তবে রাষ্ট্রপতি এমন ব্যক্তিদেরকে মন্ত্রীরূপে নিয়োগ করতে পারবেন যারা সংসদ সদস্য নন কিন্তু সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন।

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি

এভাবে নিযুক্ত মন্ত্রীদের সংখ্যা এক-দশমাংশের বেশি হবে না। (দ্বাদশ সংশোধনীর পূর্বে এ সংখ্যা ছিল এক-পঞ্চমাংশ) তাছাড়া রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, কর্ম-কমিশনের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার, বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেল, মহা-হিসাবরক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং বিদেশে রাষ্ট্রদূতদেরকে নিয়োগ করবেন। সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি সামরিক কর্মকর্তাদেরকে নিয়োগ করবেন এবং প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ পরিচালনা করবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি: রাষ্ট্রপতি সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জাতীয় সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভেঙে দিতে পারবেন। তিনি সংসদে ভাষণ দান ও বাণী প্রেরণ করতে পারবেন। সাধারণ নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রতি বছর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় জাতীয় সংসদে ভাষণ দান করতে পারবেন। কোনো 'বিল' জাতীয় সংসদে গৃহীত বা পাস হলে তা সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হবে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে বিলে সম্মতি দান করবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোনো বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা এর কোনো বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোনো সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করে একটি বার্তাসহ বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারবেন এবং রাষ্ট্রপতি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতি দান করেছেন বলে গণ্য হবে। এরূপ বিল পুনর্বিবেচনার পর জাতীয় সংসদ কর্তৃক পুনরায় গৃহীত বা পাস হলে পুনরায় তা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে ৭ দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দিতে হবে। তা না হলে ৭ দিন পর স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হবে যে, রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন এবং তা আইনে পরিণত হয়েছে।

হবে। রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলে সম্মতি দান করলে তা আইনে (Act) পরিণত হবে এবং সংসদের আইন বলে অভিহিত হবে।

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি

জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা: যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার অংশবিশেষে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার উপক্রম হলে বা অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হবার বা সংকটের সম্মুখীন হলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে। জরুরি অবস্থা বলবৎকালীন সময় সংবিধানে বিধিবদ্ধ কিছু কিছু মৌলিক অধিকারের কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, জরুরি অবস্থা ঘোষণা (১) পরবর্তী কোনো ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা যাবে, (২) জাতীয় সংসদে তা উপস্থাপিত হতে হবে, (৩) ১২০ দিন অতিবাহিত হবার পূর্বে জাতীয় সংসদ কর্তৃক তা অনুমোদিত না হলে উক্ত সময়ের অবসানে তা কার্যকর থাকবে না।

অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা ও কার্যাবলি: জাতীয় সংসদ যখন অধিবেশনে থাকবে না তখন যদি জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হবার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি তাঁর বিবেচনামত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 'অধ্যাদেশ' প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন। এসব অধ্যাদেশ আইনের মতোই কার্যকর হবে। তবে জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে প্রথম বৈঠকে উপস্থাপিত হবে এবং ইতোপূর্বে বাতিল না হয়ে থাকলে উপস্থাপনের ৩০ দিন পর তা বাতিল হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি

অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি: রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোনো অর্থবিল বা সরকারি অর্থব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত কোনো বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা যাবে না। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোনো 'মঞ্জুরি দাবি' পেশ করা যাবে না। বিশেষ প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি সংযুক্ত তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করতে পারবেন। এ ব্যাপারে তিনি একটি সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি বা অতিরিক্ত আর্থিক বিবৃতি সংসদে উত্থাপনের ব্যবস্থা করতে পারবেন। সরকারি অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, সংযুক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান বা তা থেকে অর্থ প্রত্যাহার প্রভৃতি বিষয় সংসদের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তিনি প্রত্যেক আর্থিক বছরের প্রারম্ভে সরকারের আয় ও ব্যয় দেখিয়ে একটি বার্ষিক আর্থিক বিবরণী উত্থাপন করাবেন।

বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি: সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে তিনি অন্যান্য বিচারপতিদেরকে নিয়োগ প্রদান করবেন। রাষ্ট্রপতি কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্ব ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং যেকোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করতে পারবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি

সংসদ ভেঙে দেবার ক্ষমতা২১: সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন কিংবা সংসদ ভেঙে দেবার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করবেন। প্রধানমন্ত্রী অনুরূপ পরামর্শদান করলে রাষ্ট্রপতি, অন্য কোনো সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নন এ মর্মে সন্তুষ্ট হলে, সংসদ ভেঙে দিবেন।

অন্য কার্যাবলি: রাষ্ট্রপতি এ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতির শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। তিনি বিদেশ ভ্রমণের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবেন। বাংলাদেশ সফরে আগত বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানকে তিনি অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করবেন। বিদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে তিনি সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও জাতির উদ্দেশ্যে নিজ দেশের পক্ষ থেকে বাণী প্রেরণ করবেন।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে স্থল, জল বা আকাশপথে প্রকৃত বা আসন্ন আক্রমণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশকে রক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্য তাঁর বিবেচনায় প্রয়োজনীয় যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন এবং সংসদ বৈঠকরত না থাকলে তৎক্ষণাৎ সংসদ আহ্বান করার ব্যবস্থা করতে পারবেন। সংসদ ভেঙে যাবার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রজাতন্ত্র যে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে, সেই যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান সেজন্য সংসদ পুনরায় আহ্বান করা প্রয়োজন, তা হলে যে সংসদ ভেঙে দেয়া হয়েছিল, রাষ্ট্রপতি তা আহ্বান করবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি

জ. রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা: উপরোক্ত আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে, রাষ্ট্রপতি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। বাস্তবে সংবিধান অনুযায়ী দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত থাকায় রাষ্ট্রপতি নাম-সর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি কেবল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিবেচনাকে কাজে লাগাতে পারবেন। তাছাড়া সব সময়ই তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবে সংবিধান অনুযায়ী তিনি দেশের সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী। এর ফলে তিনি দেশের সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ০৮ বাংলাদেশ সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী

টপিক ০৮: বাংলাদেশ সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারপ্রধান। তিনি নির্বাহী ক্ষমতার মধ্যমণি। তাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রীই প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধানের '৫৫(২) অনুচ্ছেদে' বলা হয়েছে যে, "প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁর কর্তৃত্বে এ সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে।"

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী

ক. নিয়োগ পদ্ধতি (Method of Appointment) : যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হবেন, রাষ্ট্রপতি তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কেননা সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 'সংসদীয় নেতাকেই' (Parliamentary leader) রাষ্ট্রপতি সংসদের আস্থাভাজন সদস্য বলে মনে করবেন। তবে যদি কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তখন 'সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তি' খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি তার সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

খ. প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ ১৭ (Tenure of office) : সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হবে, যদি-

১. তিনি কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন,

২. তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন,

৩. সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন কিংবা সংসদ ভেঙে দেবার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করবেন। তিনি অনুরূপ পরামর্শ দান করলে রাষ্ট্রপতি অন্য কোনো সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নন এ মর্মে সন্তুষ্ট হলে, সংসদ ভেঙে দিবেন।

৪. প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী

গ. প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, কার্যাবলি ও মর্যাদা (Powers, Functions and Status of the Prime Minister) সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারপ্রধান। তিনি হলেন সমগ্র শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. মন্ত্রিসভা গঠনে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা: তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগ করতে পারলেও এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাই মুখ্য। কার্যত প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের যে তালিকা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবেন তারাই মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হবেন। সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকেই তিনি অন্যান্য মন্ত্রী নিযুক্ত করবেন। প্রয়োজনবোধে পার্লামেন্টের সদস্য নন এমন নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিকেও মন্ত্রিসভায় তিনি অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। তবে এভাবে নিযুক্ত মন্ত্রীদের সংখ্যা এক-দশমাংশের বেশি হবে না।

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী

২. মন্ত্রিসভার নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা: প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভা গঠিত হবে ও পরিচালিত হবে, ক্ষমতায় টিকে থাকবে এবং ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হবে। প্রধানমন্ত্রী যে কোনো সময়ে কোনো মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করতে পারবেন। অনুরূপ অনুরোধ পালনে অসমর্থ হলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে উক্ত মন্ত্রীর নিয়োগের অবসান ঘটাবার পরামর্শ দান করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা স্বীয় পদে বহাল না থাকলে মন্ত্রীদের প্রত্যেকে পদত্যাগ করেছেন বলে গণ্য হবে। মন্ত্রিসভার অধিবেশন আহ্বান, কার্যসূচি নির্ধারণ, অধিবেশন-সভা পরিচালনা, মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন, মন্ত্রী ও বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলি পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা প্রভৃতি সকল দায়িত্ব মূলত তাঁর হাতে ন্যস্ত। এজন্য তাকে 'ক্যাবিনেট তোরণের প্রধান স্তম্ভ' (Keystone of the Cabinet arch) বলা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী

৩. জাতীয় সংসদের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা: জাতীয় সংসদের নেতা হলেন প্রধানমন্ত্রী। জাতীয় সংসদের অধিবেশন কখন আহূত হবে, কতদিন চলবে, কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর আলোচনা চলবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো বিল তাকেই পাস করানোর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। জাতীয় সংসদের বিতর্কে মন্ত্রিসভার সদস্যদেরকে তিনি সাহায্য করেন।

জাতীয় সংসদের পবিত্রতা, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার বিষয়ে তিনি স্পিকারকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন। সংসদে হুইপদের (whips) সাহায্যে তিনি নিজ দলীয় সদস্যদের প্রয়োজনীয় আদেশ, নির্দেশ প্রদান করবেন এবং তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবেন।

সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থা হারালে কিংবা অন্য কোনো কারণে প্রয়োজনবোধে প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভেঙে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এরূপ অনুরোধ পেলে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে সংসদ ভেঙে দেওয়া হলে পরবর্তী নির্বাচনে নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির অনুরোধে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী

৪. রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা: প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির সাথে মন্ত্রিসভার সংযোগ রক্ষা করবেন। মন্ত্রিসভার বক্তব্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত করা এবং প্রয়োজনবোধে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করার দায়িত্ব তাঁর ওপরই অর্পিত। জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ঘোষণা করা, ভেঙে দেওয়া এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করবেন। সংবিধানের ৪৮ (৫) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় এবং পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করলে যে কোনো বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী

৫. প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা: তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, বিচারক, রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি নিয়োগ করতে পারলেও কার্যত তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করবেন।

৬. দলীয় নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা: প্রধানমন্ত্রী হলেন তার নিজ দলের নেতা। এজন্য দলীয় স্বার্থরক্ষা, ঐক্য রক্ষা, দলের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া তাঁর মুখ্য কাজ। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাফল্যকে কেন্দ্র করেই তাঁর দল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ ভরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রে সাধারণ নির্বাচনের অর্থ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন।

৭. জাতির নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা: প্রধানমন্ত্রী শুধু সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার মধ্যমণি, দলের নেতা, রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতাই নন, তিনি হলেন জাতির নেতা ও পথপ্রদর্শক। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবার পর দলীয় ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে তাঁকে জাতীয় নেতার বৃহত্তর ভাবমূর্তি ধারণ ও অর্জন করতে হয়। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা এবং জাতীয় সংহতির প্রতীক।

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী

ঘ. প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা (Status): সংবিধানের ৫৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাহী। সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী শুধু "সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্যই" নন বরং তিনি হলেন 'মন্ত্রীরূপি তারকারাজির মধ্যে বিরাজমান চাঁদ'। বাংলাদেশ শাসনব্যবস্থার তিনি হলেন মধ্যমণি, মন্ত্রিসভার মূল স্তম্ভ। তিনি হলেন 'এমন একটি সূর্য যার চারদিকে রাজনৈতিক গ্রহগুলো আবর্তিত হয়' (He is rather a sun around which political planets)

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ০৯ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী

টপিক ০৯: বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিবৃন্দ

নাম	মেয়াদকাল
১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	১৭.০৪.১৯৭১—১১.০১.১৯৭২
২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)	১৭.০৪.১৯৭১—০৯.০১.১৯৭২
৩. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	১২.০১.১৯৭২—২৩.১২.১৯৭৩
৪. মোহাম্মদ উল্লাহ	২৪.১২.১৯৭৩—২৫.০১.১৯৭৫
৫. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	২৫.০১.১৯৭৫—১৫.০৮.১৯৭৫
৬. খন্দকার মোশতাক আহমেদ	১৫.০৮.১৯৭৫—০৬.১১.১৯৭৫
৭. বিচারপতি এ এস এম সায়েম	০৬.১১.১৯৭৫—২০.০৪.১৯৭৬
৮. মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান	২১.০৪.১৯৭৬—৩০.০৫.১৯৮১
৯. বিচারপতি আবদুস সাত্তার (ভারপ্রাপ্ত)	৩০.০৫.১৯৮১—১৯.১১.১৯৮১
১০. বিচারপতি আবদুস সাত্তার	২০.১১.১৯৮১—২৩.০৩.১৯৮২
১১. বিচারপতি এ এফ এম আহসান উদ্দিন চৌধুরী	২৭.০৪.১৯৮২—১০.১২.১৯৮৩
১২. লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১০.১২.১৯৮৩—০৫.১২.১৯৯০
১৩. বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ (অস্থায়ী)	০৬.১২.১৯৯০—০৮.১০.১৯৯১
১৪. আবদুর রহমান বিশ্বাস	০৯.১০.১৯৯১—০৮.১০.১৯৯৬
১৫. বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ	০৯.১০.১৯৯৬—১৪.১১.২০০১
১৬. অধ্যাপক ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী	১৪.১১.২০০১—২১.০৬.২০০২
১৭. ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার (অস্থায়ী)	২১.০৬.২০০২—০৬.০৯.২০০২
১৮. প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ	০৬.০৯.২০০২—১২.০২.২০০৯
১৯. মোঃ জিল্লুর রহমান	১২.০২.২০০৯—১৩.০৩.২০১৩
২০. মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট	২৪.০৪.২০১৩—০৬.০২.২০১৮
২১. মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট	০৭.০২.২০১৮—২৩.০৪.২০২৩
২২. মোঃ সাহাবুদ্দীন	২৪.০৪.২০২৩—অদ্যাবধি

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীবৃন্দ

	নাম	মেয়াদকাল
১.	তাজউদ্দিন আহমেদ	১০.০৪.১৯৭১—১২.১০.১৯৭২
২.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	১৩.০১.১৯৭২—২৫.০১.১৯৭৫
৩.	এম মনসুর আলী	২৬.০১.১৯৭৫—১৫.০৮.১৯৭৫
৪.	শাহ আজিজুর রহমান	১৫.০৪.১৯৭৯—২৪.০৩.১৯৮২
৫.	আতাউর রহমান খান	৩০.০৩.১৯৮৪—১৫.০১.১৯৮৫
৬.	মিজানুর রহমান চৌধুরী	০৯.০৭.১৯৮৬—২৭.০৩.১৯৮৮
৭.	মওদুদ আহমদ	২৮.০৩.১৯৮৮—১২.০৮.১৯৮৯
৮.	কাজী জাফর আহমেদ	১২.০৮.১৯৮৯—০৬.১২.১৯৯০
৯.	বেগম খালেদা জিয়া	২০.০৩.১৯৯১—১৪.০২.১৯৯৬
১০.	বেগম খালেদা জিয়া	১৭.০২.১৯৯৬—২০.০৩.১৯৯৬
১১.	শেখ হাসিনা	২৩.০৬.১৯৯৬—১৫.০৭.২০০১
১২.	বেগম খালেদা জিয়া	১০.১০.২০০১—২৭.১০.২০০৬
১৩.	শেখ হাসিনা	০৬.০১.২০০৯—১২.০১.২০১৪
১৪.	শেখ হাসিনা	১২.০১.২০১৪—৩০.১২.২০১৮
১৫.	শেখ হাসিনা	৩০.১২.২০১৮—১০.০১.২০২৪
১৬.	শেখ হাসিনা	১০.০১.২০২৪—অদ্যাবধি

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ১০ বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কাঠামো

টপিক ১০: বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কাঠামো

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কাঠামো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো বিচার বিভাগ। বাংলাদেশের বিচার বিভাগের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. স্তরভিত্তিক কাঠামো: বাংলাদেশ বিচার বিভাগের গঠন-কাঠামো স্তরভিত্তিক। বিচার বিভাগের শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট এবং সর্বনিম্নে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার সালিসী আদালত। প্রত্যেক জেলায় রয়েছে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার জন্য জেলা জজের আদালত এবং সেসন জজের আদালত। জেলা সদরে সাব জজ ও সহকারী জজের আদালত রয়েছে।

২. দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধির একই আদালতে বিচার: বাংলাদেশের উচ্চতর স্তরের আদালতে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিচার সম্পন্ন হয়। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে এবং জেলায় জেলা জজের আদালতে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিচার হয়। তবে অধস্তন আদালতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার জন্য স্বতন্ত্র আদালত রয়েছে।

৩. অধস্তন আদালতে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথককরণ: বাংলাদেশের উচ্চতর আদালতগুলো শাসন বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র হলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে প্রশাসকবৃন্দও বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর থেকে বিচার বিভাগকে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হয়।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কাঠামো

৪. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত না হলেও বাংলাদেশের বিচার বিভাগের পর্যালোচনা ক্ষমতা রয়েছে। জাতীয় সংসদ প্রণীত কোনো আইন সংবিধান বহির্ভূত কিনা, বিশেষ করে মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট পর্যালোচনা করে থাকে।

৫. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল: সংবিধানের '১১৭ অনুচ্ছেদে' বলা হয়েছে যে, কর্মচারী ও রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনার জন্য সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ১১ সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগের অবস্থান

টপিক ১১: সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগের অবস্থান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগের অবস্থান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের ওপর সংবিধান বিরোধী বিধি-বিধানকে অবৈধ ও বিধি-বহির্ভূত ঘোষণা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের '১০২ অনুচ্ছেদে' বলা হয়েছে যে, (১) কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এ সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যে কোনো একটি বলবৎ করার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলি বা আদেশাবলি দান করতে পারবেন।

সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগের অবস্থান

(২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোনো সমফলপ্রদ বিধান করা হয়নি, তা হলে (ক) যে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে প্রজাতন্ত্র বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোনো কাজ করা হতে বিরত রাখার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁর করণীয় কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে, বা প্রজাতন্ত্র অথবা প্রজাতন্ত্র বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো কার্যধারা আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হয়েছে বা গৃহীত হয়েছে ও তার কোনো আইনগত কার্যকারিতা নেই বলে ঘোষণা করে উক্ত বিভাগ আদেশ দান করতে পারবেন, বা

সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগের অবস্থান

(খ) যে কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনি উপায়ে কোনো ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয়নি বলে যাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হতে পারে, সে জন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করে অথবা কোনো সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলে বিবেচিত কোনো ব্যক্তিকে তিনি কোন কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবি করছেন, তা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করে উক্ত বিভাগ আদেশ দান করতে পারবেন।"

সুতরাং সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে বিচার বিভাগের মর্যাদা ও অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রুটিনমাফিক বিচার কাজ ছাড়াও সংবিধানকে ব্যাখ্যা করা, সংবিধান বহির্ভূত বিধানকে অবৈধ ঘোষণা করা, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ১২ সুপ্রিম কোর্ট

টপিক ১২: সুপ্রিম কোর্ট

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সুপ্রিম কোর্ট

গঠন ও আসন (Composition and Seat): সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। বাংলাদেশ সংবিধানের '৯৪ অনুচ্ছেদে' বলা হয়েছে যে, "সুপ্রিম কোর্ট নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকবে এবং আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে তা গঠিত হবে।"

প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। বিচারকদের প্রয়োজনীয় সংখ্যা নির্ধারণ করবেন রাষ্ট্রপতি। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ আপিল বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন। অন্যান্য বিচারকগণ হাইকোর্টে আসন গ্রহণ করবেন। রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে। তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি যে কোনো স্থানে সুপ্রিম কোর্টের অধিবেশন অনুষ্ঠান করতে পারবেন।

সুপ্রিম কোর্ট

বিচারক নিয়োগ (Appointment of Judges): সংবিধানের '৯৫ অনুচ্ছেদে' বলা হয়েছে যে, 'প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করবেন।'

বিচারক পদের যোগ্যতা (Qualifications of the Judges)

সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে:

১. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

২. সুপ্রিম কোর্টে অন্যূন দশ বছর এ্যাডভোকেট থাকতে হবে। অথবা,

৩. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বছর কাল কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকতে হবে। অথবা,

৪. সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা থাকতে হবে।

সুপ্রিম কোর্ট

বিচারকদের পদের মেয়াদ বা কার্যকাল ২২ (Tenure of the Judges)

বাংলাদেশ সংবিধানের 'অনুচ্ছেদ ৯৬'-তে বলা হয়েছে যে,

'(১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন বিচারক সাতষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোন বিচারকের অসদাচারণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

(৪) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।'

সুপ্রিম কোর্ট

সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Powers and Functions of the Supreme Court)
সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বলতে হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে বোঝায়। সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা অর্থাৎ এখতিয়ার বা কার্যাবলি নিম্নরূপ :
হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার বা ক্ষমতা২৩ (Jurisdiction of the High Court Division):
সংবিধান ও অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে হাইকোর্ট বিভাগের আদি বা মৌলিক, আপিল সংক্রান্ত ও অন্যান্য এখতিয়ার বা ক্ষমতা থাকবে। এগুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

সুপ্রিম কোর্ট

ক. আদি এখতিয়ার

১. কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের যে কোনো একটি বলবৎ করার জন্য যে কোনো রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ নির্দেশ বা আদেশ প্রদান করতে পারবে।

২. যথাযথ বিবেচনার পর হাইকোর্ট বিভাগ যদি মনে করে যে, আইনের দ্বারা উপযুক্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, তাহলে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে প্রজাতন্ত্র বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয় এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ প্রদান করবে অথবা আইনের দ্বারা তাঁর করণীয় কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করবে, অথবা সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির কাজ বা নীতি আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতীত গৃহীত হয়েছে এবং তার কোনো আইনগত কার্যকারিতা নেই বলে ঘোষণা করতে পারবে।

৩. যে কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয়েছে তাহলে প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করবে অথবা কোনো সরকারি পদে আসীন ব্যক্তি কোন্ কর্তৃত্ব বলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবি করছেন, তা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

৪. হাইকোর্ট বিভাগ এর অধীনস্থ সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ওপর বিভাগীয় তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করবে।

সুপ্রিম কোর্ট

খ. আপিল এখতিয়ার: হাইকোর্ট বিভাগ যদি মনে করে যে, অধীনস্থ কোনো আদালতের মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যাজনিত আইনের জটিল প্রশ্ন বা গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থমূলক প্রশ্ন জড়িত রয়েছে তবে সে মামলাটি তুলে এনে স্বহস্তে গ্রহণ করতে পারবে এবং নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে বা আইনের প্রশ্ন সমাধান করে তা পুনরায় উক্ত আদালতে ফেরত পাঠাতে পারবে বা অন্য কোনো আদালতে হস্তান্তর করতে পারবে।

গ. অন্যান্য এখতিয়ার: হাইকোর্ট বিভাগ এর অধীনস্থ সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ওপর বিচার বিভাগীয় তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করবে।

সুপ্রিম কোর্ট

আপিল বিভাগের এখতিয়ার ২৪ (Jurisdiction of the Appellate Division): সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের এখতিয়ার বা ক্ষমতা নিম্নরূপ:

ক. আপিল সংক্রান্ত এখতিয়ার

১. হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির ও তা নিষ্পত্তি করার এখতিয়ার আপিল বিভাগের রয়েছে।

২. হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগের নিকট নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আপিল করা যাবে:

(ক) যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ এ মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করেন যে, মামলাটির সাথে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রয়েছে, অথবা

অথবা (খ) হাইকোর্ট বিভাগ কোনো মৃত্যুদণ্ড বহাল করেছে বা কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে,

(গ) হাইকোর্ট বিভাগকে অবমাননার দায়ে উক্ত বিভাগ কোনো ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করেছে, এবং

(ঘ) জাতীয় সংসদ প্রণীত আইনের দ্বারা অন্যান্য ক্ষেত্রে।

সুপ্রিম কোর্ট

৩. হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে উল্লিখিত কারণে কোনো আপিল না চললেও আপিল বিভাগ আপিলের অনুমতি দান করতে পারবে।

৪. কোনো ব্যক্তির হাজিরা বা কোনো দলিলপত্র উদ্‌ঘাটন বা দাখিল করার আদেশ-নির্দেশসহ আপিল বিভাগের নিকট বিচারাধীন যে কোনো মামলার বিষয়ে ন্যায়বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ, আদেশ, ডিক্রি বা রিট আপিল বিভাগ জারি করতে পারবে।

৫. জাতীয় সংসদের আইন সাপেক্ষে এবং আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিধি সাপেক্ষে আপিল বিভাগ নিজস্ব ঘোষিত যেকোনো রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারবে।

সুপ্রিম কোর্ট

খ. উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার

রাষ্ট্রপতি যদি কোনো সময় মনে করেন যে, আইনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত প্রয়োজন তাহলে তিনি তা আপিল বিভাগের নিকট প্রেরণ করবেন। এক্ষেত্রে আপিল বিভাগ উপযুক্ত বিবেচনার পর রাষ্ট্রপতিকে নিজ মতামত জ্ঞাপন করতে পারবে (অনুচ্ছেদ ১০৬)।

সুপ্রিম কোর্ট

সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য কার্যাবলি

১. সুপ্রিম কোর্টের বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা: জাতীয় সংসদের বিধান সাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে এর অধীনস্থ সকল আদালতের নীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করতে পারবে (অনুচ্ছেদ ১০৭)।

২. তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা: হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে (অনুচ্ছেদ ১০৯)।

৩. নিয়োগ সংক্রান্ত: প্রধান বিচারপতি বা তাঁর নির্দেশক্রমে অন্য কোনো বিচারক বা কর্মচারী সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারীদের নিযুক্ত করবেন এবং রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী এই নিয়োগদান করা হবে (অনুচ্ছেদ ১১৩ (১))।

৪. কোর্ট অব রেকর্ড: সুপ্রিম কোর্ট একটি 'কোর্ট অব রেকর্ড' হবেন এবং এর অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশ দান বা দণ্ডাদেশ দানের ক্ষমতাসহ আইন-সাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী হবেন (অনুচ্ছেদ ১০৮)।

৫. কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ: জাতীয় সংসদ প্রণীত বিধান সাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্ট প্রণীত বিধিসমূহের যেরূপ নির্ধারিত হবে, সুপ্রিম কোর্টের কর্মকর্তাদের কর্মের শর্তাবলি সেরূপ হবে (অনুচ্ছেদ ১১৩ (২))।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ১৩ সুপ্রিম কোর্টের ‘পর্যালোচনা ক্ষমতা’

সুপ্রিম কোর্টের ‘পর্যালোচনা ক্ষমতা’

বাংলাদেশ সংবিধান সুপ্রিম কোর্টকে 'বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা' ক্ষমতাও প্রদান করেছে। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান বিরোধী বিধি-বিধানকে অবৈধ ও বিধি বহির্ভূত ঘোষণা করতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নিকট বিচারপ্রার্থী হয়ে কোনো ব্যক্তি যদি বলেন যে, সংশ্লিষ্ট আইন সংবিধান বিরোধী এবং সেই অবৈধ আইনের ফলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাহলে বিচারকগণ সে আইনের বৈধতা বিচার করবেন। মামলার রায়ে যদি বিচারক বলেন যে, আইনটি সংবিধান সম্মত নয় তাহলে সেই আইন অবৈধ বলে গণ্য হবে। সংবিধানের প্রথম ভাগে ৭(২) এবং ১০২ অনুচ্ছেদে সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ বাতিল করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের ‘পর্যালোচনা ক্ষমতা’

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

বাংলাদেশ সংবিধানের '১১৭ অনুচ্ছেদে' বলা হয়েছে যে, “জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।" এসব ট্রাইব্যুনালের কাজ হবে,

১. নবম ভাগে বর্ণিত বিষয়াদি এবং অর্থদণ্ড বা অন্য দণ্ডসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলি।

২. যে কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের চালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপ উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যসহ কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন সরকারের ওপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোনো সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি ব্যবস্থা।

৩. সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যেসব বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগের কার্যকারিতা থাকে না সেসব বিষয়ে। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হলে অনুরূপ ট্রাইব্যুনাল এখতিয়ারের অন্তর্গত কোনো বিষয়ে অন্য কোনো আদালত কোনোরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করবে না বা কোনো প্রকার আদেশ প্রদান করবে না। তবে জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা কোনো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায় বা সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনায় বা অনুরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের বিধান করতে পারবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ১৪ বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

টপিক ১৪: বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। বিচার বিভাগ যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হয় তাহলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বাংলাদেশ সংবিধানে বিচার বিভাগকে সরকারের অন্য দুটি বিভাগ থেকে পৃথক করা হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রীয় মূলনীতি অংশে বলা হয়েছে যে, "রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। বিচার বিভাগই নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের প্রকৃষ্ট রক্ষাকবচ এবং বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ হতে তা রক্ষা করবে। বিচার বিভাগ গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের একটি মানদণ্ড।"

বাংলাদেশে জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে বিচার বিভাগের হাতে। বিচার বিভাগ মৌলিক অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যহীন আইনকে বাতিল বলে গণ্য করতে পারবে।

বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন হয়। একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করাই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতিদের মূল লক্ষ্য। এজন্য ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণের কথা বলা হয়। শুধু তাই নয় সংবিধানের ১১৫-১১৬ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শক্রমে অধঃস্তন আদালতের বিচারক নিয়োগ ও তাদের পদোন্নতি সংক্রান্ত বিষয় নিশ্চিত করা হয়। ১৯৭৬ সালে বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেনের নেতৃত্বাধীন আইন কমিটি বিচার বিভাগ পৃথককরণের সুপারিশ করলেও সরকার তা বাস্তবায়ন করেনি। ১৯৯০ সালে '৩ জোটের রূপরেখায়' নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৯৫ সালে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন যে, 'সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে পূর্বাবস্থায় (১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের অবস্থায়) ফিরিয়ে নিলে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যাবে।' ১৯৯৫ সালে আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য সালাউদ্দীন ইউসুফ 'বিচার বিভাগ পৃথককরণ বিল' জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। এ বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে আলোচনার জন্য প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

১৯৯৯ সালের ২ ডিসেম্বর 'মাজদার হোসেন মামলার' রায়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণের বিষয়ে সর্বসম্মত রায় ঘোষণা করে। আপিল বিভাগ একথাও ঘোষণা করে যে, সংবিধান সংশোধনী ছাড়াই নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণের বিষয়টি প্রায় পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব। আপিল বিভাগ এ লক্ষ্যে ১২ দফা গাইড লাইন বা নির্দেশনা ঘোষণা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মাজদার হোসেন মামলার রায় কার্যকর করতেও সরকার দীর্ঘসূত্রিতার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বারবার (২৬ বার) সময় প্রার্থনা করে। অবশেষে উচ্চ আদালতের নির্দেশে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এজন্য ২০০৭ সালের ১৬ জানুয়ারি একটি প্রজ্ঞাপন এবং ৪টি বিধি জারি করা হয়। ২৫ এসব বিধিমালা বাস্তবায়িত হলে প্রশাসন ক্যাডারের যেসব ম্যাজিস্ট্রেট বিচার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন তাঁরা নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবেন। মূলত ২০০৭ সালের ১৬ জানুয়ারি বিচার বিভাগের পৃথককরণের অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। অবশেষে বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক হয়ে যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ১৫ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক ১৫: বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোকে নিম্নে দুটি ছকের সাহায্যে তুলে ধরা হলো :

বাংলাদেশের স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো (ছক-১) :

উপরের ছকটিতে বাংলাদেশের স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো দেখানো হয়েছে। এর প্রথম স্তরটি কেন্দ্রীয় প্রশাসন। সচিবালয় হলো এ প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র। সচিবালয় সরকারের কর্মসূচি, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করে থাকে। সব মন্ত্রণালয় নিয়েই সচিবালয় গঠিত। দ্বিতীয় স্তরটি মাঠ প্রশাসন। মাঠ প্রশাসনের প্রথম ও সর্বোচ্চ ধাপ হলো বিভাগীয় প্রশাসন। একজন বিভাগীয় কমিশনার ও কয়েকজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার এই প্রশাসন পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসক এ প্রশাসনের প্রধান। তৃতীয় বা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা প্রশাসন। নিম্নে বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার কাঠামো (ছক-২) দেখানো হলো:

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার কাঠামো (ছক-২) :

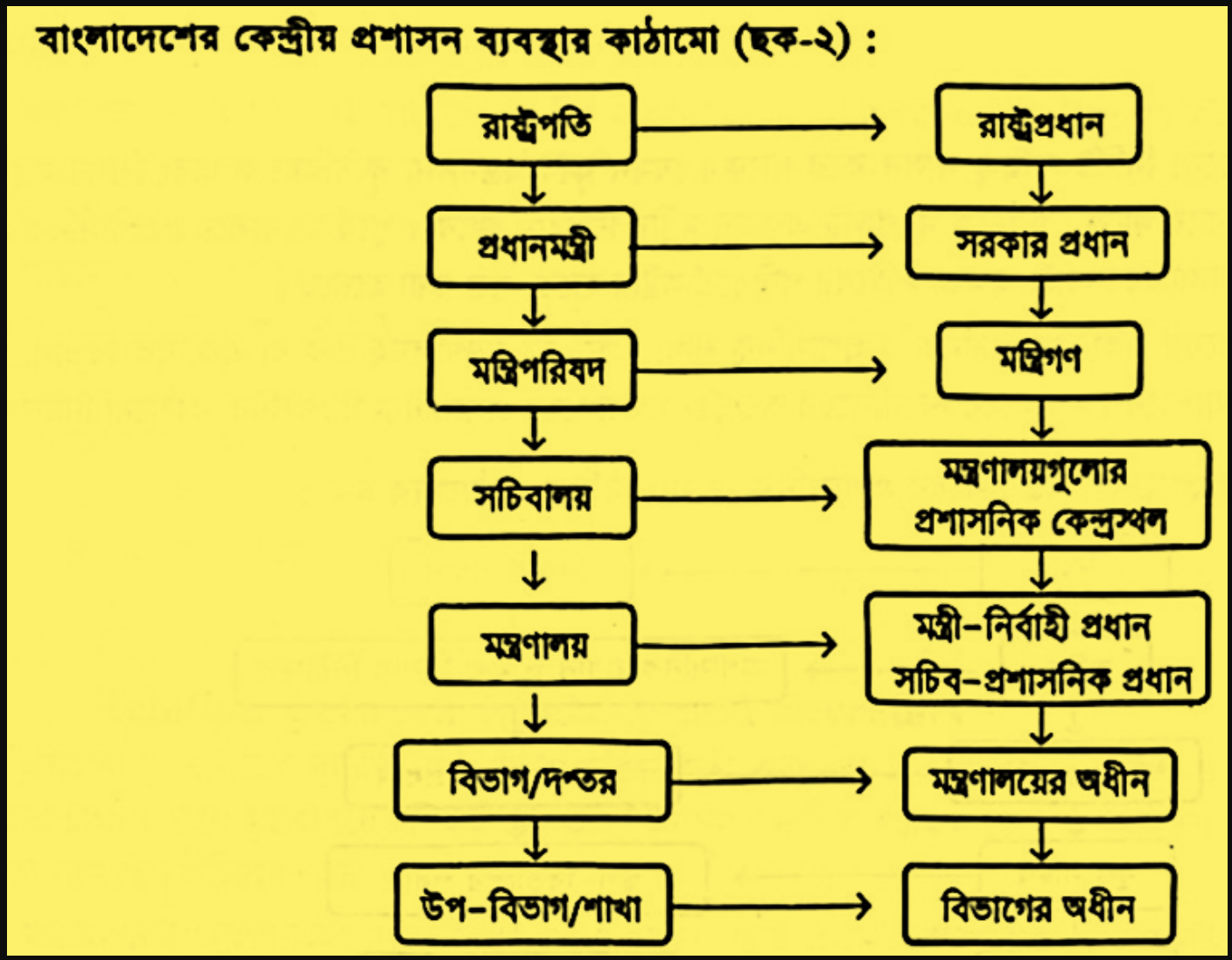

ক. রাষ্ট্রপতি: রাষ্ট্রপতি হলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার শীর্ষ ব্যক্তি। তার নামেই প্রজাতন্ত্রের সকল কাজকর্ম সম্পন্ন হয়। তবে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন 'নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান' (Constitutional Head)। নির্বাহী ক্ষমতা চর্চা করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করেন।

খ. প্রধানমন্ত্রী : বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত। সাধারণ নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংসদীয় নেতাকেই প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারপ্রধান (Head of the Government) I মন্ত্রিপরিষদের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভার সাহায্যে প্রধানমন্ত্রীই নির্বাহী ক্ষমতা পরিচালনা করেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা সকল কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকেন।

গ. মন্ত্রিসভা : মন্ত্রিসভার সদস্যগণ প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মন্ত্রিগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। প্রধানমন্ত্রী সকল মন্ত্রীর দপ্তর বণ্টন করেন এবং সকল মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয় সাধন করেন।

ঘ. সচিবালয় : সচিবালয় (Secretariat) হলো বাংলাদেশ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুস্বরূপ। সচিবালয় কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের (Ministry) সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি মন্ত্রণালয় একজন মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। সচিবালয়ে শাসন ব্যবস্থার নীতিসমূহ প্রণীত ও পর্যালোচিত হয় এবং তা সমগ্র দেশে কার্যকরী হয়।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

সচিবালয়

বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়গুলোকে যৌথভাবে 'সচিবালয়' বলা হয়। সচিবালয় বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার স্নায়ুকেন্দ্র। সচিবালয় সরকারের কর্মসূচি, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করে থাকে।

প্রশাসনিক সংগঠনের পদসোপানে সচিবালয়ের স্থান সর্বোচ্চ। সচিবালয় হচ্ছে সকল ক্ষমতার আধার। সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের শুধু নীতি নির্ধারণেই সাহায্য করে না বরং তাঁরা মন্ত্রীদেরকে সংসদীয় সমালোচনা ও নানা প্রশ্নের উত্তর প্রণয়ন ও তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করে থাকেন। বাংলাদেশ সরকারের নীতি ও কর্মসূচি সচিবালয়েই জন্মলাভকরে। বাংলাদেশে প্রশাসনিক সকল সিদ্ধান্তই সচিবালয় প্রণয়ন করে থাকে। সুতরাং বাংলাদেশের প্রশাসন হলো কেন্দ্রীকৃত প্রশাসন এবং সচিবালয়ই হচ্ছে এর প্রাণকেন্দ্র।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

মন্ত্রনালয়

বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়গুলো নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে থাকে। যেমন কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষিবিষয়ক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষাবিষয়ক নীতি নির্ধারণ করে থাকে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় একজন মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে থাকে। পূর্বে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন সচিব। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী ক্ষমতা সচিবের পরিবর্তে মন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় হচ্ছে সচিবালয়ের একটি সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক শাখা। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ই এক বা একাধিক বিভাগ, উইং, শাখা বা সেকশনে বিভক্ত। বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয়ের অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ :

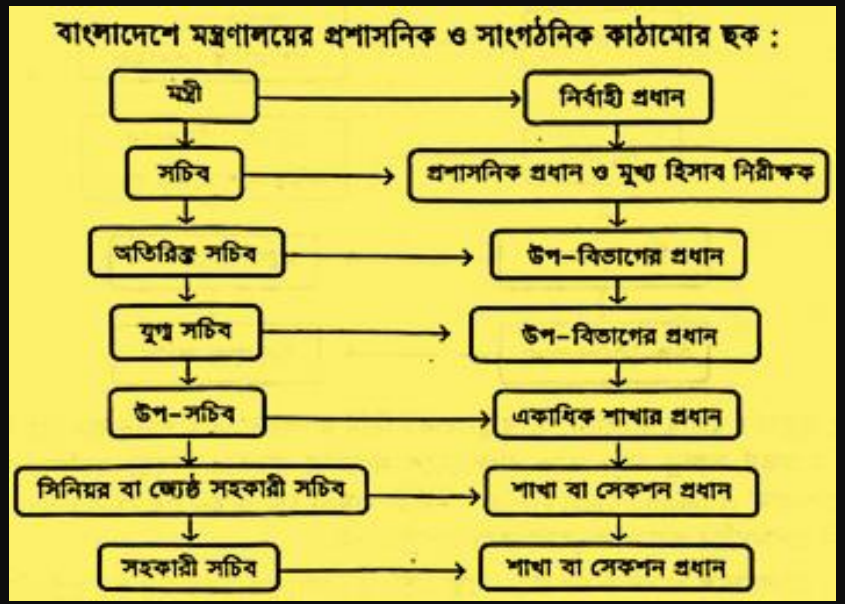

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ১৬ সচিবালয় ও মন্ত্রনালয় সম্পর্ক

টপিক ১৬: সচিবালয় ও মন্ত্রনালয় সম্পর্ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সচিবালয় ও মন্ত্রনালয় সম্পর্ক

সচিবালয় ও মন্ত্রণালয় পারস্পরিক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে সচিবালয় হলো মন্ত্রণালয়গুলোর সমষ্টি। বাংলাদেশের সমস্ত মন্ত্রণালয় এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্নায়ুকেন্দ্র হলো সচিবালয়।

অপরদিকে মন্ত্রণালয় হচ্ছে সচিবালয়ের এক একটি সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক শাখা। সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সব ধরনের কাজই সম্পাদন করে থাকেন।

সচিবালয় ও মন্ত্রনালয় সম্পর্ক

সচিবালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ

সচিবালয়ের প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের সাথে বেশ কিছু সংশ্লিষ্ট বিভাগ, সংযুক্ত কার্যালয় ও অধীনস্থ অফিস রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ, সংযুক্ত কার্যালয় এবং অধীনস্থ অফিসগুলো মন্ত্রণালয়ের বিশেষ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন 'জনসংস্থা' (Public Corporation)। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতির জন্য এসব সংশ্লিষ্ট বিভাগ, কার্যালয়, অধীনস্থ অফিস ও জনসংস্থার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সচিবালয় এবং এর অন্তর্গত মন্ত্রণালয়গুলো হলো নীতি-নির্ধারক সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ, অফিস বা অধিদপ্তরগুলো হলো উক্ত নীতিসমূহ বাস্তবায়নকারী সংস্থা। এগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান প্রদান করে থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ১৭ সচিব

টপিক ১৭: সচিব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সচিব

মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর পরই সচিবের স্থান। সচিব মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধানের প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও যাবতীয় কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। তিনি তাঁর মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও অধীনস্থ অফিসসমূহের কার্যবিধি যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা সতর্কতার সাথে তদারক করেন। শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে নীতি প্রণয়ন ও নির্ধারণের লক্ষ্যে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত মন্ত্রীকে সরবরাহ করেন। জাতীয় সংসদে মন্ত্রীর বক্তব্য, প্রশ্নের উত্তর প্রভৃতি সবকিছুই মূলত সচিব তৈরি করে দেন। মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কার্যাদি সচিব মন্ত্রীকে অবহিত করে থাকেন।

এছাড়াও সচিবের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মন্ত্রণালয়ের 'মুখ্য হিসাব নিরীক্ষক' (Principal Accounting Officer) হিসেবে দায়িত্ব পালন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিবরণীর জন্য সচিব জাতীয় সংসদের হিসাব কমিটিতে প্রশ্নোত্তর প্রদান এবং অন্যান্য অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে জবাবদিহি করেন।

সচিব

মন্ত্রী ও সচিব সম্পর্ক

প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে একজন মন্ত্রী এবং এক বা একাধিক প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর হাতে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী ক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব মন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করেছেন। তার পূর্ব পর্যন্ত এ দায়িত্ব ও ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল সচিবের ওপর।

মন্ত্রীর পরই অবস্থান হলো সচিবের। তিনি হলেন মন্ত্রীর প্রধান পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা। সচিব মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে মন্ত্রীকে সহায়তা প্রদান করে থাকেন। সচিব মন্ত্রণালয়ের কাজ সম্পর্কে সবসময় মন্ত্রীকে অবহিত রাখেন। সচিব মন্ত্রণালয়ের জন্য সঠিক নীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে সকল তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান মন্ত্রীকে সরবরাহ করে থাকেন।

সচিব

অতিরিক্ত সচিব

মন্ত্রণালয়ে সচিবের পরেই অতিরিক্ত সচিবের স্থান। তিনি সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কাজে সচিবকে সহায়তা প্রদান করে থাকেন। সচিবের নির্দেশে তিনি বিশেষ দায়িত্বও পালন করে থাকেন। তবে যেসব মন্ত্রণালয়ে সচিব নেই সেখানে অতিরিক্ত সচিবই মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়ে মন্ত্রীর উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে থাকেন। অতিরিক্ত সচিব বিশেষ ধরনের নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অনুবিভাগের বা উইং-এর দায়িত্ব পালন করেন।

সচিব

যুগ্ম সচিব

অতিরিক্ত সচিবের পরই যুগ্ম সচিবের স্থান। একটি মন্ত্রণালয়ে একাধিক যুগ্ম সচিব থাকেন। যুগ্ম সচিব মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক বিভাগ নিয়ে গঠিত উইং বা অনুবিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার দায়িত্ব পালন করেন। যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) কর্মচারী এবং কার্যালয় ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ অর্থ উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একজন যুগ্ম সচিবের অধীনে থাকেন ২ থেকে ৪ জন উপসচিব।

সচিব

উপ সচিব

একটি মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি শাখা নিয়ে গঠিত এক বা একাধিক ব্রাঞ্চের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন উপ-সচিব। যুগ্ম সচিবের এবং ক্ষেত্রবিশেষে অতিরিক্ত সচিবের তত্ত্বাবধানে এবং পরামর্শক্রমে তিনি তার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। উপ-সচিব সরাসরি মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন না। ১ জন উপ-সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১ থেকে ৫ জন ঊর্ধ্বতন সহকারী সচিব/সহকারী সচিব থাকেন।

সচিব

ঊর্ধ্বতন সহকারী সচিব/সহকারী সচিব

মন্ত্রণালয়ের এক একটি শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন একজন সিনিয়র বা ঊর্ধ্বতন সহকারী সচিব ও একজন সহকারী সচিব। তাঁরা নির্দিষ্ট শাখার রুটিনমাফিক কাজ পরিচালনা করেন। তাঁরা উপ-সচিবের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তাঁর নির্দেশমত দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ১৮ বিভাগীয় প্রশাসন ও বিভাগীয় কমিশনার

টপিক ১৮: বিভাগীয় প্রশাসন ও বিভাগীয় কমিশনার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বিভাগীয় প্রশাসন ও বিভাগীয় কমিশনার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রের পরই বিভাগীয় প্রশাসনের স্থান। বাংলাদেশে বর্তমানে আটটি বিভাগ রয়েছে। বিভাগগুলো হলো- (১) ঢাকা বিভাগ, (২) রাজশাহী বিভাগ, (৩) খুলনা বিভাগ, (৪) চট্টগ্রাম বিভাগ, (৫) বরিশাল বিভাগ, (৬) সিলেট বিভাগ, (৭) রংপুর বিভাগ এবং (৮) ময়মনসিংহ বিভাগ। বিভাগীয় প্রশাসনিক প্রধানের নাম 'বিভাগীয় কমিশনার'। তাঁকে সাহায্য করে থাকেন একজন অতিরিক্ত কমিশনার ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। বিভাগীয় কমিশনার বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ ও প্রবীণ সদস্য। বিভাগীয় কমিশনার নিজ বিভাগের রাজস্ব সংগ্রহ ও তত্ত্বাবধান এবং রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত মামলা পরিচালনাকারী। বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি। বিভাগের এবং বিভাগীয় কমিশনার পদের সৃষ্টি হয় ১৯২৯ সালে।

বিভাগীয় প্রশাসন ও বিভাগীয় কমিশনার

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যাবলি (Functions of Divisional Commission)

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. প্রশাসনিক কাজ: বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকগণের কাজের সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় সহকারী কমিশনারদের বদলি করেন। তিনি জেলা প্রশাসনের জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের এবং রাজস্ব বিভাগের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ করেন।

২. ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ: বিভাগীয় কমিশনার নিজ বিভাগের রাজস্ব সংগ্রহ ও তত্ত্বাবধান এবং রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত মামলা পরিচালনাকারী। তিনি নিজ বিভাগের জেলাসমূহের রাজস্ব কর্মচারীদের কার্যাবলি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন।

৩. উন্নয়নমূলক কাজ : বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি। তিনি ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)-দের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয় সাধন করেন। বিভাগের উন্নয়নমূলক কাজের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তাঁর ওপরই ন্যস্ত।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কাজ: বিভাগীয় কমিশনার পদাধিকার বলে বিভাগীয় সদরের সরকারি কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিভাগীয় প্রশাসন ও বিভাগীয় কমিশনার

৫. সেবামূলক কাজ: দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিভাগীয় কমিশনার জনগণের সাহায্যার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
৬. ক্রীড়া ও সংস্কৃতিবিষয়ক কাজ: তিনি বিভাগীয় ক্রীড়া বোর্ডের সভাপতি। তাঁর পরিচালনায় "জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ" উদযাপিত হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।
৭. সরকারকে অবহিতকরণ: বিভাগের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সার্বিক পরিস্থিতি, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিভাগীয় কমিশনার সরকারকে অবহিত করে থাকেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ১৯ জেলা প্রশাসন ও ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)

টপিক ১৯: জেলা প্রশাসন ও ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জেলা প্রশাসন ও ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)

বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর বা একক হচ্ছে জেলা। ডেপুটি কমিশনার এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক স্তর বা এককের মধ্যমণি। জেলা প্রশাসনের চাবিকাঠি হচ্ছেন ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)। ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)-এর পদকে কেন্দ্র করেই জেলার সমস্ত প্রশাসন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক) পদের উদ্ভব: বর্তমান সময়ের জেলা গঠিত হয়েছিল মুঘল শাসনামলে। বর্তমান ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)-এর পদকে মুঘল আমলের 'আমল গুজার' বা 'আমিল'-এর সাথে তুলনা করা চলে। শেরশাহ্ সর্বপ্রথম প্রশাসন ও কর আদায়ের সুবিধার্থে তৎকালীন শাসনব্যবস্থার প্রধান একক 'সুবাহ' বা প্রদেশকে কতগুলো 'সরকারে' বিভক্ত করেন। এ সরকারগুলো ব্রিটিশ আমলে 'জেলা' হিসেবে পরিচিত হয়। কিন্তু মুঘল আমলে যেখানে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষার জন্য একজন 'ফৌজদার', কর আদায়ের জন্য একজন 'আমীর' এবং বিচারকার্যের জন্য একজন 'কাজী' বা 'মীর আদল' নামের পদাধিকারী ব্যক্তি থাকতেন, সেখানে ব্রিটিশ শাসন আমলে একজন ডেপুটি কমিশনারের হাতে প্রশাসন পরিচালনা, কর আদায় ও বিচারকার্য পরিচালনার ভারও অর্পিত হয়। এ পদ কার্যকরী হয় ১৭৬৯ সালে। ১৭৯০ সাল হতে এ পদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ একক হিসেবে 'ডেপুটি কমিশনার' (জেলা প্রশাসক) প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

জেলা প্রশাসন ও ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)

ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের কার্যাবলি
(Role or Functions of D.C.): বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনিক একক হিসেবে জেলা প্রশাসনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'ডেপুটি কমিশনার' এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক এককের শীর্ষবিন্দু। তাকে কেন্দ্র করেই জেলা প্রশাসন পরিচালিত, আবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ জন্যই তাঁকে 'জেলা প্রশাসনের চাবিকাঠি' বলা হয়।
ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসক নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন:
১. প্রশাসনিক কাজ: ডেপুটি কমিশনার জেলার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। প্রশাসন সংক্রান্ত সমস্ত দায়-দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত। বাংলাদেশ সচিবালয় হতে প্রেরিত সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা তাঁর নিকট প্রেরিত হলে তিনি অধঃস্তন সহকর্মীদের সহযোগিতায় সেগুলো বাস্তবায়িত করেন। জেলায় অবস্থিত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে তিনি সংযোগ রক্ষা করেন। প্রয়োজনবোধে এগুলোর কাজের তদারক করেন। জেলার প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে থাকেন। এ জন্যই তাকে 'জেলা প্রশাসনের মধ্যমণি' বলা হয়ে থাকে।

জেলা প্রশাসন ও ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)

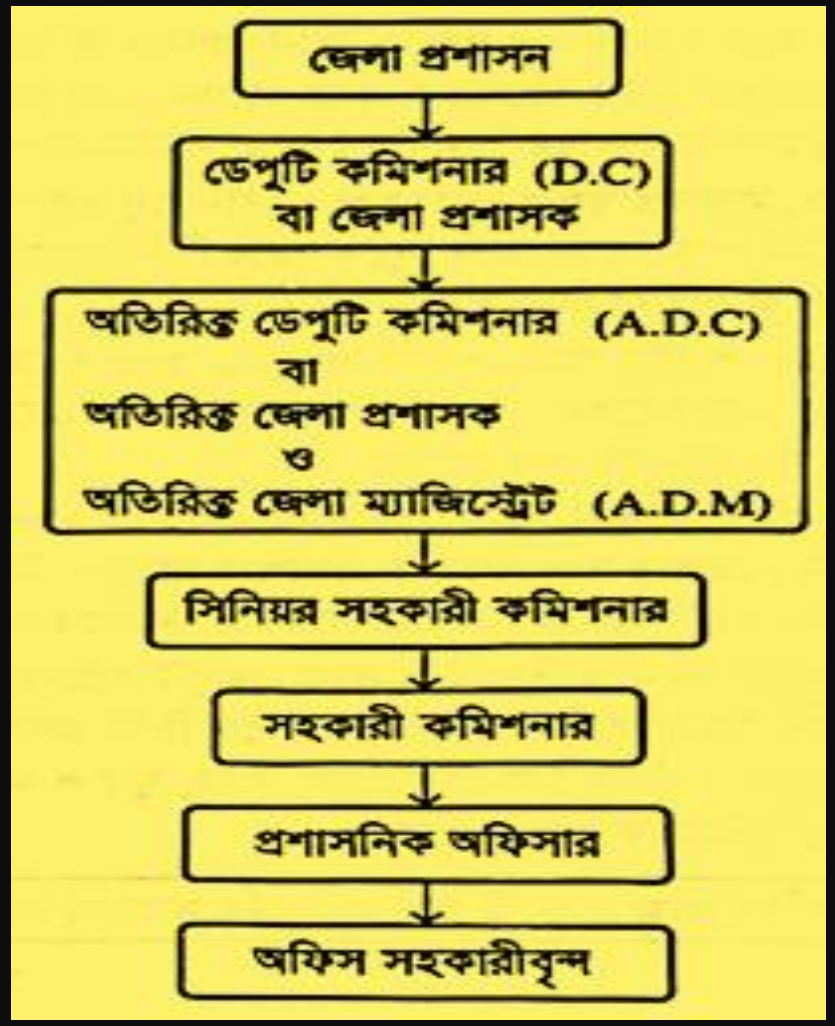

জেলা প্রশাসন ও ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)

২. যোগাযোগ সম্পর্কিত কার্যাবলি: ডেপুটি কমিশনার সরকার ও জনগণের মধ্যে 'মিলন সেতু' হিসেবে কাজ করে থাকেন। সরকারের নীতি ও কর্মসূচিসমূহ তিনি জেলার জনগণকে অবহিত করেন। আবার জেলার প্রকৃত চিত্র তিনি সরকারের নিকট উপস্থাপিত করেন। জেলার জনগণের বাস্তব যে চিত্র তিনি তুলে ধরেন সে আলোকেই সরকারের কর্মসূচি ও নীতিমালা গড়ে ওঠে।

৩. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা: তিনি জেলার সমস্ত শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করেন এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করেন। এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (ADC), ম্যাজিস্ট্রেটগণ ও জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট (SP) তাঁকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকেন।

৪. রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যাবলি: জেলা কালেক্টর হিসেবে ডেপুটি কমিশনারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জেলার সরকারি রাজস্ব, জেলা জলকর, অন্যান্য কর ও ভূমি রাজস্ব তিনি আদায় করে থাকেন। তিনি জেলার সরকারি কোষাগারের নিয়ন্ত্রক এবং খাসমহলের তত্ত্বাবধায়ক।

জেলা প্রশাসন ও ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)

৫. বিচারসংক্রান্ত কার্যাবলি: ডেপুটি কমিশনার একজন বিচারকেরও ভূমিকা পালন করে থাকেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণির বিচারক হিসেবে ফৌজদারি মামলার বিচার করে থাকেন এবং দুই বছরের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা করতে পারেন।

৬. উন্নয়নমূলক কার্যাবলি: ডেপুটি কমিশনার জেলার সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। জেলায় অবস্থিত কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি দপ্তরের কার্যাবলি তিনি তদারক করে থাকেন। তিনি এসব কাজে উৎসাহ যোগান ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও নির্দেশাবলি প্রদান করেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাঁর ভূমিকা অদ্বিতীয়।

৭. তত্ত্বাবধানমূলক কার্যাবলি তিনি জেলার অভ্যন্তরে বিভিন্ন দপ্তর ও প্রশাসনিক সংস্থার কাজ, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল সার্জন, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, স্কুলসমূহের পরিদর্শক, কারাগার পরিদর্শক ও জেলার অন্যান্য প্রশাসনিক কাজের তত্ত্বাবধান তিনি করে থাকেন।

৮. সমন্বয় রক্ষাকারী কার্যাবলি: ডেপুটি কমিশনার বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের মধ্যে প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ ছাড়াও তিনি জেলার বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে মেলামেশা করে বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। এর ফলে তিনি শুধু জেলার বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যেই সমন্বয় সাধন করেন না, বরং বিভিন্ন পেশার মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকেন।

জেলা প্রশাসন ও ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)

৯. মানবতামূলক কার্যাবলি: তিনি শুধু একজন প্রশাসকই নন, তিনি জনগণের বন্ধুও। জেলার জনগণের সকল প্রকার আপদে-বিপদে, ভাল-মন্দে, সুখে-দুঃখে তিনি সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা ও ঝড়-ঝঞ্ঝায় তিনি জনগণকে সাহায্য করে থাকেন।

১০. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত কাজ: ডেপুটি কমিশনার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এসব স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে সরকারের মৌলিক নীতিমালা যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা ডেপুটি কমিশনার সেদিকে লক্ষ রাখেন।

জেলা প্রশাসন ও ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)

উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

বাংলাদেশের স্থানীয় বা মাঠ প্রশাসনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (UNO) এর নির্বাহী প্রধান। উপজেলার প্রশাসনিক কাজ তদারক করার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত। তিনি উপজেলার উন্নয়ন কাজ তদারক করেন এবং সরকারি অর্থের ব্যয় তত্ত্বাবধান করেন। তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। তিনি উপজেলা কোষাগারের রক্ষক। এছাড়াও তিনি সরকার প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেন।

জেলা প্রশাসন ও ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)

কেন্দ্রের সাথে স্থানীয় বা মাঠ প্রশাসনের সম্পর্ক

বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশে কোনো প্রদেশ নেই। বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় 'কেন্দ্রীভূতকরণ' (Centralization) নীতি ও অবস্থা বিরাজমান। বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার স্নায়ুকেন্দ্র হলো সচিবালয়। সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের (ব্যাপকভাবে বলতে গেলে সরকারের) শুধু নীতি নির্ধারণেই সাহায্য করে না বরং তাঁরা মন্ত্রীদেরকে সংসদীয় আলোচনা-সমালোচনা ও নানা প্রশ্নের উত্তর প্রণয়ন ও তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করে থাকেন। বাংলাদেশ সরকারের নীতি ও কর্মসূচি এবং সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সচিবালয়েই জন্মলাভ করে। সুতরাং বাংলাদেশের প্রশাসন হলো কেন্দ্রীভূত প্রশাসন এবং সচিবালয়ই হচ্ছে এর প্রাণকেন্দ্র।

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কেন্দ্রে যে নীতি বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে স্থানীয় বা মাঠ প্রশাসন।

জেলা প্রশাসন ও ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)

কেন্দ্রের সাথে স্থানীয় বা মাঠ প্রশাসনের সম্পর্ক

কেন্দ্রে অবস্থিত বাংলাদেশ সরকার বিভাগীয় কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারগণ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে নিয়োগ, বদলি, তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। বিভাগীয় কমিশনার বাংলাদেশ সরকারের নীতি ও কার্যক্রম বিভাগে বাস্তবায়িত করে থাকেন। ডেপুটি কমিশনারকে 'সরকারের চোখ, কান, নাক ও মুখ' হিসেবে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশ সরকার নীতি নির্ধারণের পূর্বে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীল। বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সরকার জনমতের প্রতিফলন বুঝতে এবং জানতে পারে। এজন্যই বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সততা, দক্ষতা ও কর্মকুশলতার ওপর সরকারের সাফল্য অনেকটা নির্ভরশীল।

জেলা প্রশাসন ও ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)

কেন্দ্রের সাথে স্থানীয় বা মাঠ প্রশাসনের সম্পর্ক

বাংলাদেশের প্রশাসনে বিরাজমান 'কেন্দ্রীভূতকরণ' অবস্থা ও নীতির ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, প্রশাসনিক দায়িত্বহীনতা, ঔদাসীন্য ও লালফিতার দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। এজন্য অনেকেই এখন প্রশাসনিক 'বিকেন্দ্রীকরণ' নীতি বাস্তবায়নের দাবি উত্থাপন করছেন। বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন ও বিড়ম্বনা হ্রাসের জন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে মাঠ প্রশাসনের সুসম্পর্ক স্থাপনকে অনেকে তাই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ২০ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১।বাংলাদেশের আইনসভার সাংবিধানিক নাম কী? [রা. বো. ২০১৬; ব. বো. ২০১৬; চ. বো. ২০১৭]

ক. জাতীয় সংসদ খ. বিধান সভা গ. লোকসভা ঘ. প্রতিনিধিসভা

২।বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য হওয়ার ন্যূনতম বয়স কত?[ব. বো. ২০১৯]

ক. ১৮ খ. ২৫ গ. ৩০ ঘ. ৩৫

৩।কতজন সংসদ সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদে 'কোরাম' হবে? অথবা, কোরামের জন্য কতজন সদস্য প্রয়োজন?[ঢা. বো. ২০১৯, ২০১৬]

ক. ৪০ খ. ৫০ √গ. ৬০ ঘ. ৭০

৪। জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভেঙে দিতে পারেন কে?

ক. রাষ্ট্রপতি খ. প্রধানমন্ত্রী গ. স্পিকার ঘ. প্রধান বিচারপতি

৫। জাতীয় সংসদের মেয়াদ কত বছর?

ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ

৬।জাতীয় সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি এবং পরবর্তী অধিবেশনের মধ্যে কতদিনের বেশি বিরতি থাকবে না?

ক. ৫০ দিন খ. ৬০ দিন গ. ৭০ দিন ঘ. ৮০ দিন

৭।একাদিক্রমে কত বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকলে কোনো জাতীয় সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে?সি. বে. ২০১৬]

ক. ৭০ খ. ৮০ গ. ৮৫ ঘ. ৯০

৮।একাধিক আসনে বিজয়ী প্রার্থী কোন্ আসনে প্রতিনিধিত্ব করতে চান তা' কতদিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হয়?

ক. ২৫ খ. ৩০ গ. ৩৫ ঘ.৪০

১০।জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা কত?

ক. ৩০০ খ. ৩৩০ গ. ৩৪৫ ঘ. ৩৫০

১১। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা কত?

[রা. বো. ২০১৬; কু. বো. ২০১৬; ব. বো. ২০১৬; চ. বো. ২০১৬]

ক. ৪০ খ. ৪৫ গ. ৫০ ঘ. ৫৫

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১২। সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হন কীভাবে?[রা. বো. ২০১৭]

ক. নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে খ. সমঝোতার ভিত্তিতে

গ. জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ঘ. সদস্যদের আনুপাতিক প্রতিনিধিদের ভিত্তিতে

১৩। জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে- [য. বো. ২০১৬]

i. মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বিষয়ে

ii. সরকারি আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে

iii. নিন্দাসূচক প্রস্তাব এনে

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক. I খ. Ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৪। জাতীয় সংসদে কে বাজেট পেশ করেন? [চ. বো. ২০১৬]

ক. রাষ্ট্রপতি খ. প্রধানমন্ত্রী গ. অর্থমন্ত্রী ঘ. অর্থ সচিব

১৫। জাতীয় অর্থ তহবিলের নিয়ন্ত্রক কে? [য. বো. ২০১৭]

ক. প্রধানমন্ত্রী খ. জাতীয় সংসদ গ. রাষ্ট্রপতি ঘ. অর্থমন্ত্রী

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

টপিক – ২১ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

রাফিন তার বাবার সাথে টেলিভিশনে বাজেট অধিবেশন দেখছিল। বাজেট আলোচনায় সংসদ সদস্যগণ অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিলেন। তিনি সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। রাফিন তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, অর্থমন্ত্রী কি সংসদ সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য? বাবা বললেন, মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করে সংসদীয় কর্তৃত্বকে স্বীকার করেছেন।[কু. বো. ২০১৬]

প্রশ্ন:

ক. সংসদ অধিবেশন আহ্বান করেন কে?

খ. পঞ্চদশ সংশোধনীর পর জাতীয় সংসদের গঠন বর্ণনা কর।

গ. উদ্দীপকে সংসদের কোন্ কার্যটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যটি ছাড়া সংসদ আর কী কী কাজ করতে পারে-আলোচনা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

একটি সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে বিভিন্ন পদে নিয়োগদান করেন। সভাপতির নামে সংগঠনটির কার্যক্রম পরিচালিত হলেও সাধারণ সম্পাদকই মূলত যাবতীয় কার্যাবলির সফলতা-ব্যর্থতার জন্য দায়বদ্ধ। সাধারণ সম্পাদক সংগঠনটির নেতৃত্ব প্রদান করলেও এর সদস্যদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সভাপতি হ্রাস-বৃদ্ধি বা রহিত করতে পারেন।

[রা. বো. ২০১৬] প্রশ্ন:

ক. কোন্ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়?

খ. অভিশংসন বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক পদের সাথে তোমার দেশের শাসন বিভাগের কোন্ পদাধিকারীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের সভাপতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তোমার দেশের নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পুনঃবিবেচনার ক্ষমতা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। তুমি কী এ বক্তব্য সমর্থন কর? যুক্তি দাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

একটি রাষ্ট্রে দুটি সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন জনাব বদরউদ্দিন ও জনাব কামরুজ্জামান। জনাব বদরউদ্দিনের নামে সরকারের সকল নির্বাহী ক্ষমতা গৃহীত হলেও তিনি কোনো ক্ষেত্রেই স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন না। এমনকি উচ্চপদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রেও তাকে জনাব কামরুজ্জামানের সাথে পরামর্শ করতে হয়। [য. বো. ২০১৬]

প্রশ্ন:

ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী?

খ. বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও আপসহীনতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ.জনাব বদরউদ্দিনের কাজের সাথে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের কোন্ ব্যক্তির মিল আছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনাব বদরউদ্দিন ও জনাব কামরুজ্জামানের কাজের ধারা বাংলাদেশের শাসন বিভাগের আলোকে তুলনামূলকবিশ্লেষণ কর।

THANK YOU